ইউনিট ৭

সামাজিক সংস্কার ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন

ভূমিকা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও সংস্কারের এক প্রবল জোয়ার বয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অনৈসলামিক ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ জীবন ধারায় ফিরে যাওয়া। তাদের ধর্মীয় রীতি নীতি ও সমাজ জীবনে অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রভাবে যে সব অনৈসলামিক কাজ ও ভাবাদর্শ অনুপ্রবেশ করেছিল সে গুলোকে দূর করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া এবং বাংলা ও ভারতের কিছু অঞ্চল জুড়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শে জেহাদ আন্দোলন পরিচালিত হয়। প্রথম দু'টি আন্দোলন মূলত ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে শুরু হলেও কৃষক প্রজাদের মধ্যে আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণে শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্বে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার জমিদার নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করায় পরিণতিতে এই সংস্কারমুখী প্রচেষ্টা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। জেহাদ আন্দোলন ও বিশুদ্ধ ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণায় শুরু হয়েছিল। তবে শিখ ও ইংরেজ বিরোধী চেতনা এর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠায় এটি ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে।

উপরের তিনটি আন্দোলন সংঘটিত হবার পূর্বে আঠার শতকের শেষার্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন। ফকির সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত জীবন ধারায় ইংরেজ সরকার বাধা সৃষ্টি করলে তারা ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি বাংলা ও বাংলার বাইরে মুসলমান সমাজে পরিচালিত সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনসমূহ এবং ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ সম্পর্কে জানতে পারবেন। তা ছাড়া ঐ সব আন্দোলনের ইংরেজ বিরোধী চরিত্র অর্জনের কারণ কি ছিল, সে সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

পাঠ ১

ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ফকির ও সন্ন্যাসীদের জীবন-আচার ও ধর্মীয় রীতি নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইংরেজদের সাথে তাঁদের বিরোধের কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ফকির সন্ন্যাসীদের অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায় ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল বৃটিশ বিরোধী একটি সশস্ত্র সংগ্রাম। ঐ সময়কার মাদারিয়া সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত ফকির এবং বৈদান্তিক হিন্দুযোগী সন্ন্যাসীদের জীবনাচার ও ধর্মীয় রীতি নীতি ছিল প্রায় অভিন্ন। উভয়েই নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন অবস্থায় থাকত, চুল জটার মতো করে বাঁধত এবং তারা ছিলেন সংসার ত্যাগী। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ফকির ও সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। কালক্রমে এই ভিক্ষাবৃত্তি তাদের অধিকারে পরিণত হয়। ধর্মীয় উৎসব বা তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ভ্রাম্যমান সংঘে বিভক্ত হয়ে প্রায় সারা বছর ফকির সন্ন্যাসীরা একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত এবং নানা ধরনের হাল্কা অস্ত্র তারা সাথে বহন করত। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এদের কার্যকলাপ ছিল মুক্ত ও স্বাধীন।

ফকির ও সন্ন্যাসীদের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কারণ

ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টি করে, তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং তাদেরকে ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করে। ফলে ফকির ও সন্ন্যাসীরা সুদীর্ঘ কালক্রমে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তাদের এ তৎপরতা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং ঐ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে তাদের আন্দোলন দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল না।

ভিক্ষাবৃত্তি বেআইনী ঘোষণা

বিদ্রোহের গতি

ফকির ও সন্ন্যাসীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারী কুঠি, জমিদারদের কাছারী ও নায়েব গোমস্তার বাড়ী। লঠি, বর্শা, তরবারী ও গাদা বন্দুক ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র। চাকুরী হারা অনেক সৈনিক এবং দুর্দশাগ্রস্থ বহু কৃষক তাদের সংগ্রামে যোগ দেয়। ফকিরগণ বাংলার অধিবাসী হলেও তাদের আন্দোলনের প্রধান নেতারা ছিলেন অবাঙালী। বিদ্রোহে ফকির দলের নেতৃত্ব দেয় মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক।

ফকির দলের নেতৃত্ব দেন মজনু শাহ ও সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু করে। এরপর একদল ফকির ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হামলা করে। তাদের আক্রমণের মুখে কুঠির প্রধান মি. লিস্টার পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ফকির দল বিনা বাঁধায় কুঠি দখল করে লুণ্ঠন করে। সে বছরেই সন্ন্যাসীরা রাজশাহীতে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হানা দেয়। ফ্যাক্টরির প্রধান মি. বেনেটকে তারা বন্দি করে এবং পাটনায় নিয়ে পরে তাকে হত্যা করে। উত্তর বঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসী তৎপরতার অবসান কল্পে ক্যাপ্টন ডি. ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে এক অভিযান প্রেরিত হয়। সেই অভিযানের সময় ইংরেজ পক্ষের লেফটেন্যান্ট কিথ এবং তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়।

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ফকির মজনু শাহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা গড়ে তোলেন। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কোম্পানিকে রংপুর ও দিনাজপুরে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ দুই হাজার সশস্ত্র অনুগামীসহ রাজশাহী আক্রমণ করেন এবং কোম্পানির রাজস্ব অফিস লুণ্ঠন করেন। পরের বছর অন্য এক সংঘর্ষে সন্ন্যাসীদের হাতে ক্যাপ্টেন টমাস পরাজিত ও নিহত হন। মজনু শাহের সাথে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যধ্যক্ষ রবার্টসনের বাহিনীর এক তীব্র সংঘর্ষ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে মজনু শাহ পলায়ন করেন। এর পরেও উত্তর বঙ্গ এবং ময়মনসিংহে ইংরেজ বাহিনীর সাথে মজনু শাহ-এর কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়।

পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ

ফকির আন্দোলনের অবসান

ঐ সব সংঘর্ষে মজনু শাহের রণকৌশল ছিল গেরিলা কায়দায় আক্রমণ ও নিরাপদে পলায়ন করা। কিন্তু কোম্পানির পক্ষে কখনো তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ফকির মজনু শাহ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ফকির দলের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, সোবহান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকিরগণ। এঁরাও কয়েক বছর কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল, সংঘবদ্ধতার অভাব, সরকারী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ফকিরদের প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

ভবানী পাঠকের মৃত্যু

ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠকের সঙ্গে ফকির দলনেতা মজনু শাহের যোগাযোগ ছিল। রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চল ছিল তাঁর আশ্রয়স্থল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের অধীনে একদল বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণে ভবানী পাঠক ও তাঁর দুই সহকারী নিহত হন এবং অপর ৪২ জন বন্দি হয়। দেবি চৌধুরাণী নামের একজন ছোট জমিদারের সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগযোগ ছিল বলে এক সরকারী নথিতে উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপক হত্যাকান্ডের ফলে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন দৃশ্যতঃ স্তিমিত হয়ে গেলেও এতে বৃটিশ বিরোধী জনমত গড়ে উঠে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম। ইংরেজ সরকার ফকির ও সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত জীবন ধারায় বাঁধা সৃষ্টি করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিররা সুদীর্ঘ সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মজনু শাহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাদের সংগ্রামের অবসান ঘটে। সন্ন্যাসী আন্দোলনে প্রধান নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হলে এই আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. ফকির ও সন্ন্যাসীদের রাজনৈতিক তৎপরতা প্রথম শুরু হয় —
   ক. ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে

২. বাংলায় ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন —
   ক. আহমদ শাহ খ. মজনু শাহ
   গ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ. মাদার বক্স

৩. ফকির নেতা মজনু শাহ মারা যান —
   ক. ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে

৪. ভবানী পাঠকের সাথে যে জমিদারের যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়, তিনি হচ্ছেন —
   ক. দেবী চৌধুরাণী খ. ঢাকার জমিদার
   গ. নওয়াব আলী চৌধুরী ঘ. ফজল গাজী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ফকির ও সন্ন্যাসীরা কেন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করেন?
২. কিভাবে ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলনের অবসান ঘটে?

পাঠ ২

ফরায়েজী আন্দোলন ও হাজী শরিয়ত উল্লাহ্

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহর জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফরায়েজী আন্দোলন বলতে কি বুঝায়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফরায়েজী আন্দোলনের প্রকৃতি কি ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ফরায়েজী আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহর ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।

হাজী শরিয়ত উল্লাহর শিক্ষা জীবন

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মুসলমান সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ লক্ষ করে ফরিদপুর নিবাসী হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আদর্শে স্ব-ধর্মাবলম্বীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করেন এটি 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের প্রবর্তক হাজী শরিয়ত উল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান শরিয়তপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কলিকাতায় এবং পরে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরাতে শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর শিক্ষক মৌলানা বাশারাত আলীর সঙ্গে হজ্জ করতে মক্কা শরীফে যান। দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান কালে তিনি সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত তাহের সম্বলের নিকট ইসলাম ধর্মের উপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আরবে অবস্থান কালে শরীয়ত উল্লাহ ওয়াহাবী সংস্কার আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে উক্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ

শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার আন্দোলন

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর হাজী শরিয়ত উল্লাহ উপলব্ধি করেন যে, বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। মুসলিম সমাজকে এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, অর্থাৎ ফরজ, তা মেনে চলা ও পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহবান করেন। পীর পূজা, কবর পূজা, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা প্রভৃতিকে তিনি 'শিরক' বা মহা পাপের কাজ বলে ঘোষণা করেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত অন্যান্য কুসংস্কার যেমন- জন্মের সময় চাট্টি পালন, মহরমে শোক করা, মৃতের সৎকারের সাথে ফাতেহা ও ওরসের নানা প্রকার রেওয়াজ, মিলাদ উদ্‌যাপন, গাজী কালুর বন্দনা, পীরের দোহাই দেয়া, ভেলা ভাসানো, জারী গান গাওয়া ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানকে অনৈসলামিক বলে সেগুলো বর্জনের জন্য তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দেন।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলনের স্বরূপ

শরিয়ত উল্লাহ ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। সে জন্য একে তিনি 'দারুল হারব' বলে ঘোষণা দেন এবং বিধর্মী শাসিত দেশে দুই ঈদ ও জুম্মার নামাজ নিষিদ্ধ করেন। ঐ সময়ে বাংলায় জমিদার শ্রেণী পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসবের সময় প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করত। তিনি মুসলমান কৃষকদেরকে এ সব অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য উপদেশ দেন। তা ছাড়া কতিপয় জমিদার কর্তৃক গরু জবাই নিষেধ করা হলে তা অমান্য করার জন্যও তিনি শিষ্যদের আহবান জানান। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ তিনি করেননি। জমির আবাদকারী অর্থাৎ চাষীই ফসলের মালিক এবং এতে জমিদারের কোন অধিকার নেই বলে তিনি ফতোয়া দেন। জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য তিনি তার অনুগামীদের আহবান জানান।

ফরায়েজী আন্দোলনের বিস্তার

হাজী শরিয়ত উল্লাহর আহ্বান পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষককূলের মধ্যে জাগায় এক নব উদ্দীপনা ও সাড়া। দলে দলে তারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অল্পদিনের মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ফরিদপুর, ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলায় প্রসার লাভ করে। তবে চির প্রচলিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী অনেকেই তাঁর বিরোধিতা করে এবং নানাভাবে তাঁকে বাঁধা দান করে। অত্যাচারী হিন্দু জমিদাররাও ফরায়েজীদের বিরোধিতা করে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার রামনগর নামক স্থানে ফরায়েজীদের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের বিরোধ বাঁধে এবং শেষ পর্যন্ত তা দাঙ্গা হাঙ্গামার রূপ নেয়। স্থানীয় হিন্দু জমিদারেরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শরিয়ত উল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারীদের রামনগরে অবস্থিত তাদের প্রধান প্রচার কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করে। ফরায়েজীরা সেখান থেকে মাদারীপুরের বাহাদুর পুর গ্রামে সরে আসে এবং হাজী শরিয়ত উল্লাহ সেখানে থেকে অবশিষ্ট সময় শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলনের প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এরপর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া।

সার-সংক্ষেপ

হাজী শরিয়ত উল্লাহ পরিচালিত ফরায়েজী আন্দোলন মূলত একটা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে সব অনৈসলামিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ সেগুলো বর্জন করার জন্য তাদেরকে আহবান জানান। বহু লোক তাঁর আহবানে সাড়া দিলেও প্রাচীনপন্থীরা তাঁর বিরোধিতা করে। কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের কারণে এ আন্দোলন জমিদার বিরোধী সংগ্রামের পর্যায়ে উপনীত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন —
   ক. দুদু মিয়া খ. নবাব সলিমুল্লাহ
   গ. হাজী শরিয়ত উল্লাহ ঘ. তিতুমীর

২. হাজী শরিয়ত উল্লাহর জন্মস্থান —
   ক. ঢাকা জেলায় খ. মাদারীপুরে
   গ. শরিয়তপুর জেলায় ঘ. খুলনা জেলায়

৩. বিধর্মীদের রাজত্বের কারণে ফরায়েজীদের আন্দোলন কালে ভারতবর্ষকে বলা হয়েছিল—
   ক. দারুল ইসলাম খ. দারুল হারব
   গ. দোজখপুর আয নিয়ামত ঘ. হাবিয়া দোজখ

৪. শরিয়ত উল্লাহর পরে ফরায়েজীদের নেতৃত্ব দেন —
   ক. সৈয়দ আহমদ খান খ. তিতুমীর
   গ. মাওলানা কেরামত আলী ঘ. দুদু মিয়া

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ফরায়েজী আন্দোলন বলতে কি বুঝায়?
২. হাজী শরিয়ত উল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনের স্বরূপ কি ছিল?
৩. ফরায়েজী আন্দোলন কতটুকু বিস্তার লাভ করেছিল?

পাঠ ৩

ফরায়েজী আন্দোলন ও দুদু মিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- হাজী শরিয়ত উল্লাহর পরবর্তী সময়ে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফরায়েজী আন্দোলনে দুদু মিয়ার ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। কিন্তু একে যিনি সাংগঠনিক দিক থেকে সুসংহত রূপ দেন তিনি হলেন তাঁরই পুত্র মুহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া। পিতার মত তিনি কোন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন না। তবে অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি এ আন্দোলনকে জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রায়ত ও চাষীদের বলিষ্ঠ সংগ্রামে পরিণত করেন।

দুদু মিয়া কর্তৃক খিলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা

দুদু মিয়ার জন্ম ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। অল্প বয়সেই হজ্জ করার জন্য তিনি মক্কা শরীফে যান এবং সেখানে ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পিতার আদর্শ প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং অসাধারণ দ্রুত গতিতে দুদু মিয়ার অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফরায়েজীদিগকে সংঘবদ্ধ করা এবং হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে প্রজা সাধারণকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন এবং ফরায়েজী সম্প্রদায়ের জন্য নীচ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমিক সুবিন্যস্ত একটি খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রাম পর্যায়ে নিয়োগ করেন গাঁও খলিফা এবং এর উপরে ছিল সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা। তা ছাড়া দুদু মিয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপরস্থ খলিফা পদে নিয়োগ করেন। দুদু মিয়া ছিলেন তাঁর শিষ্যদের ওস্তাদ আর খলিফারা ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। এছাড়া তিনি সনাতনী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথার পুনরুত্থান ঘটান এবং সাম্য ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সব ধরনের অভিযোগ ও মামলা মোকদ্দমা সালিশের

মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। কোর্ট কাচারীর দুর্নীতি, ঘুষ, মিথ্যা সাক্ষ্য ইত্যাদির তুলনায় দুদু মিয়া ও ফরায়েজীদের সালিশী ব্যবস্থা এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ফরায়েজী অধ্যুষিত এলাকা থেকে সরকারী কোর্ট ও আদালতে মোকদ্দমা দায়ের এক রকম বন্ধ হয়ে যায়।

লাঠিয়াল বাহিনী গঠন

দুদু মিয়া অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের মোকাবেলায় মোল্লা জালাল উদ্দিনের অধীনে একটি সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। এছাড়া তিনি ফরায়েজীদের সাহায্য করার জন্য একটি ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে উদ্দেশ্যে একটি তহবিল ও গড়ে তোলা হয়। বিপদে আপদে এ তহবিল থেকে ফরায়েজীদের সাহায্য দেয়া হতো। এমনকি কোর্ট কাচারিতে মামলার খরচ মিটানোর জন্যও এ তহবিল থেকে তারা অর্থ সাহায্য পেত।

জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন

পিতার নমনীয় নীতি ও মধ্যম পন্থা পরিত্যাগ করে দুদু মিয়া সক্রিয়ভাবে ফরায়েজী আদর্শ কার্যকর করার ব্যবস্থা নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, জমির মালিক আল্লাহ্, ফসল কৃষকেরই প্রাপ্য এবং এতে খাজনা আদায়ের অধিকার কারও নেই। তাঁর অনুসারীদেরকে তিনি জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর আদায়কৃত সব ধরনের অন্যায্য কর প্রদান থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। এর ফলে জমিদাররা একদিকে যেমন সন্ত্রস্ত হয়, অন্য দিকে দলে দলে কৃষক প্রজা তাঁর দলভুক্ত হয়। জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দুদু মিয়া বলেছিলেন যে, তাঁর আহ্বানে যে কোন মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার লোক সাড়া দেবে।

দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা

দুদু মিয়ার আহ্বানে খাজনা প্রদান বন্ধ করার কারণে ফরিদপুর জেলার হিন্দু জমিদাররা প্রজাদের উপর খুবই নির্যাতন শুরু করলে জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে লাঠিয়াল বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে। অনেক জমিদারদের সঙ্গে ফরায়েজীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। শত শত লোককে কারাবরণ ও জুলুম সহ্য করতে হয়। ইংরেজ নীলকরদের সাথে হাত মিলিয়ে জমিদারগণ চেষ্টা করে দুদু মিয়া পরিচালিত প্রজা অভ্যুত্থান দমন করতে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে তিনি সব মামলা থেকে রেহাই পান।

ফরায়েজী আন্দোলনের অবসান

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে অন্তরীণ রাখে। দুই বছর পর তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ফরিদপুরের পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তি পান। কঠোর পরিশ্রম ও কারাবরণের ফলে দুদু মিয়ার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকায় পরলোকে গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী এ আদর্শের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচার করতে থাকেন। ফলে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

সার-সংক্ষেপ

ফরায়েজী আন্দোলনের সূত্রপাত হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র মাধ্যমে ঘটলেও এ আন্দোলন সুসংহত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যান তাঁর পুত্র দুদু মিয়া। অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দুদু মিয়ার সময়ে ফরায়েজী আন্দোলন সাড়া জাগায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ক্রমশ এ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. দুদু মিয়ার জন্ম —
   ক. ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে

২. দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনীর নেতা ছিলেন —
   ক. মৌলভী বাশারাত আলী খ. হাজী আহমেদ
   গ. মোল্লা জালাল উদ্দীন ঘ. মাওলানা আবদুল্লাহ্

৩. দুদু মিয়ার ফতোয়া অনুযায়ী জমির প্রকৃত মালিক —
   ক. ফরায়েজীরা খ. আল্লাহ্
   গ. কৃষক শ্রেণী ঘ. জমিদার

৪. ফরায়েজী আদর্শের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচার করেন —
   ক. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ খ. সৈয়দ আহমদ খান
   গ. মীর নিসার আলী ঘ. মাওলানা কেরামত আলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. দুদু মিয়া কিভাবে খেলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন?
২. জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে দুদু মিয়া কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

পাঠ ৪

তিতুমীরের আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলতে পারবেন।
- তিতুমীরের আন্দোলনের চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্দোলনের ঘটনাবলীর একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন

পূর্ব বাংলায় (আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ) যখন ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠে, প্রায় একই সময়ে পশ্চিম বাংলায়ও আরেকটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এ আন্দোলনেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত কুসংস্কার এবং অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে ইসলামের আদর্শে বাংলার মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার কারণে জমিদারদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি সরকার বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি গ্রামের এক মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন এবং সে গ্রামের ব্যায়ামাগারে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কুস্তিগীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছুদিন তিনি নদীয়ার এক জমিদারের লাঠিয়ালের চাকুরী করেন। পরে দিল্লীতে সভ্রান্ত বংশীয় এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সাথে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলেম ও জেহাদ আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিতুমীর ধর্ম সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তিতুমীরের প্রাথমিক জীবন

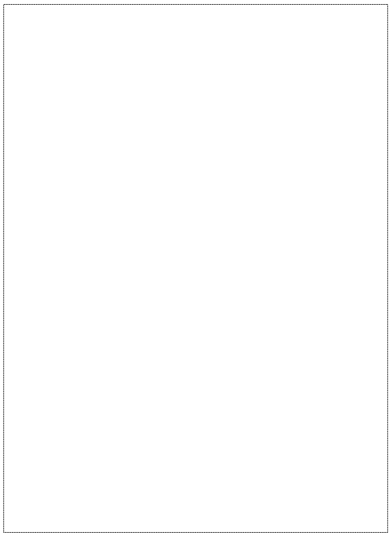

তিতুমীর

ঐ যুগে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তিতুমীর মুসলমানদেরকে পীরের কাছে নত হওয়া, মাজার তৈরি করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা, মহররম অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে যে ভিন্ন প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে, সে সমস্ত দূর করে ইসলাম ধর্মের আদি বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালান। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকশ মুসলমান তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তারা দাঁড়ি রাখত এবং বিশেষ পোষাক পরত। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এমন গোঁড়ামী সৃষ্টি হয় যে, অন্য মুসলমানদের সঙ্গেও তাদের বিরোধ বাঁধে। তবে এর চেয়ে বেশি তীব্র হয়েছিল হিন্দু জমিদারদের প্রতিক্রিয়া।

তিতুমীরের ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ

চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক ও তাঁতী তিতুমীরের আন্দোলনে সাড়া দেয়। মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ হতে দেখে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তারা তিতুমীরের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন শুরু করে। তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, পূঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং আরো অনেকে তাদের জমিদারীতে মুসলমান রায়তদের প্রত্যেকের দাঁড়ি রাখার উপর আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করেন। সরফরাজপুরের প্রজাগণ এই অন্যায় কর প্রদানে অস্বীকার করলে তাদের উপর নেমে আসে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন। মুসলমানদের একটি মসজিদও পুড়িয়ে দেয়া হয়। তিতুমীর এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার চেয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় অবশেষে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নেন।

জমিদারদের সাথে সংঘাত

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিতুমীর ও তাঁর সমর্থকরা তাদের প্রধান ঘাঁটি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করা হয়। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে উঠে একটি সুদক্ষ লাঠিয়াল ও প্রতিরোধ বাহিনী। এবার তিতুমীরের অনুসারীরা জমিদারদের অন্যায়ের প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মসজিদ ভস্মীভূত করার প্রতিশোধ হিসেবে তারা পূঁড়ার জমিদারীতে এক মন্দিরের অবমাননা করে। লাউঘাটায় এক সংঘর্ষে জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। পার্শ্ববর্তী অনেকগুলো গ্রামে উপর

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা

তিতুমীরের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারদের প্ররোচনায় মুল্লাহাটির নীলকুঠির পক্ষ থেকে তিতুমীরের সমর্থকদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেয়ায় তাঁর বাহিনী নীলকুঠি আক্রমণ করে তা লুণ্ঠন করে। কুঠির তত্ত্বাবধায়ককে বন্দী করে নিয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত জমিদার ও নীলকররা ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠায়।

ইংরেজ ও জমিদারদের সাথে তিতুমীরের সংঘর্ষ

বৃটিশ সরকার শীঘ্রই তিতুমীরের বিরুদ্ধে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং তাদের ১৫ জন নিহত ও বহু আহত হয়। আলেকজান্ডারকে সহায়তা দানের অভিযোগে তিতুমীরের সমর্থকরা কয়েকটি নীলকুঠি লুণ্ঠন করে। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ৩০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু এবারও ইংরেজ সৈন্যরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। পরিশেষে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেজর স্কটের অধীনে এক বিরাট ইংরেজ বাহিনী নারিকেল বাড়িয়া আক্রমণ করে। তিতুমীরের সমর্থকরা সাহসের সাথে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা সহজেই ধ্বংস হয়। যুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর বহু অনুগামী শহীদ হন। সেনাপতি গোলাম মাসুমসহ প্রায় আড়াইশ জন বন্দী হন। এক বিচার প্রহসনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেয় এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড প্রদান করে। এভাবে তিতুমীরের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যা পরিণতিতে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাশেরকেল্লা ধ্বংস তিতুমীরের মৃত্যু

সার-সংক্ষেপ

তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত ধর্ম সংস্কার করা। যে সব অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে সে সব বর্জন করার জন্যই তিনি আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে এ আন্দোলন কৃষক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ইংরেজদের সাথেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. তিতুমীরের আন্দোলন পরিচিত হয় যে নামে; তা হলো —
   ক. জেহাদ আন্দোলন খ. তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া
   গ. ফরায়েজী আন্দোলন ঘ. বৈষ্ণব আন্দোলন

২. তিতুমীরের আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল —
   ক. রাজনৈতিক খ্যাতিলাভ খ. জনকল্যাণ
   গ. ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ঘ. ইংরেজ শাসন উৎখাত

৩. মক্কায় তিতুমীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন —
   ক. দুদু মিয়ার খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর
   গ. সৈয়দ আহমদ শহীদের ঘ. শাহ ওয়ালিউল্লাহর

৪. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্মিত হয়েছিল —
   ক. উলুবেড়িয়ায় খ. নারিকেলবাড়িয়ায়
   গ. চাঁদপুরে ঘ. সরফরাজপুরে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. তিতুমীর কেন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন?

২. ইংরেজ ও জমিদারদের সাথে তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ দিন।

পাঠ ৫

জেহাদ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- জেহাদ আন্দোলন কি এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- জেহাদ আন্দোলনে সৈয়দ আহমদ শহীদের ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরে আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জেহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত

দিল্লীর বিখ্যাত সুফি সাধক শাহ ওয়ালি উল্লাহ এবং তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজিজের সংস্কার আন্দোলনের ভাবধারায় প্রভাবিত যুক্ত প্রদেশের রায়বেরেলির সৈয়দ আহমদ শহীদ উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে জেহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিধর্মী আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব রোধ করে বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদেরকে অত্যাচারী শাসনের হাত থেকে রক্ষার ব্রত নিয়ে তিনি জেহাদ আন্দোলনের ডাক দেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর কর্মকান্ডকে ওহাবী মতবাদের আদর্শে উজ্জীবিত মনে করে থাকলেও আন্দোলনের নেতারা একে 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' বলে অভিহিত করেছেন। এ আন্দোলনের সংগঠকরা সমগ্র ভারতবর্ষে আন্দোলনকে প্রসারিত করার চেষ্টা করলেও মূলত পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল প্রত্যক্ষ জেহাদের স্থান। অবশ্য বাংলা এবং বিহার থেকে বিপুল সাহায্য ও সমর্থন আন্দোলনের পক্ষে আসে।

সৈয়দ আহমদের সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ

সৈয়দ আহমদের জন্ম ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌর নিকটে রায়বেরেলীতে। বাল্যকালে নিজ গৃহে লেখাপড়া শেষে তিনি দিল্লীতে যান। দু'বছর বিখ্যাত আলেম শাহ আবদুল আজিজের নিকট কুরআন ও হাদীস শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁর সুফিমত ও সংস্কার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি কিছুদিন মধ্যভারতের টংকে নবাব আমীর খাঁর সেনাবাহিনীতে চাকুরি করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং সমাজ সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের আদি বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে বহু সংখ্যক লোককে তিনি নিজের মতবাদে দীক্ষিত করেন। ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য তিনি মুসলিম সমাজকে জেহাদ করার আহবান জানান। সৈয়দ আহমদ ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকশত শিষ্যকে সাথে নিয়ে কলকাতা হয়ে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। কলকাতা যাবার পথে বহু লোক তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে।

শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ

প্রায় দু'বছর পর রায়বেরেলিতে প্রত্যাবর্তন করে সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হন। এ সময় পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর শিখ প্রভাবাধীনে ছিল। শিখনেতা রণজিৎ সিংহের অত্যাচারে পাঞ্জাবের মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তাদের মুক্তির উদ্দেশ্য সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। হাজার হাজার মুজাহিদ তাঁর

সাথে এসে যোগ দেয়। সীমান্তের পাঠানদের সহযোগিতায় শিখ রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সহজতর হবে অনুমান করে সৈয়দ আহমদ শিষ্যদের নিয়ে ১৮২৬ সালের জানুয়ারি মাসে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পথে রওয়ানা হন। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারত থেকে জেহাদের জন্য মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের খালসা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে সৈয়দ আহমদের মৃত্যু

সৈয়দ আহমদ মুসলিম অধ্যুষিত নওশেরাতে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রথম দিকে শিখ সর্দার রণজিৎ সিংহ মুজাহিদদের উপস্থিতিকে ততটা গুরুত্ব দেননি। কয়েকটি যুদ্ধে শিখদের পরাভূত করে জেহাদীগণ পেশোয়ার দখল করে। সৈয়দ আহমদ সেখানে একটি মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপন করেন এবং তিনি এর ইমাম বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এ সময়ে পাঠানদের মধ্যে দলগত বিরোধের দরুন অনৈক্য সৃষ্টি হয়। সুচতুর রণজিৎ সিংহ হীন কূটকৌশলের মাধ্যমে ছোট ছোট মুসলিম আমীরদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ জাগিয়ে তুলে তাদেরকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এ সুযোগে তিনি পেশোয়ার পুনরুদ্ধার করেন। পাঠান দলপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সৈয়দ আহমদ তাঁর সামরিক কেন্দ্র বালাকোটে স্থানান্তর করেন। রণজিতের খালসা বাহিনী বালাকোট আক্রমণ করে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সৈয়দ আহমদ, শাহ ইসমাইল এবং আরো অনেকে যুদ্ধে শহীদ হন। শিখ বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে মুজাহিদদের একটি অংশ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় এবং পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে।

জেহাদ আন্দোলনের দুর্বলতা

সৈয়দ আহমদ শহীদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তখন এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইনায়েত আলী, বিলায়েত আলী এবং আরও অনেকে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে মুজাহিদরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা পাঞ্জাবের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর সেখান থেকে মুজাহিদদের বিতাড়িত করে। এ সময় থেকে জেহাদ আন্দোলন মূলত বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক হান্টারের মতে, "সব সময়েই তারা (জেহাদীরা) সীমান্তের আদি জাতিগুলোকে ব্যস্ত রেখেছিল বৃটিশ শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংঘর্ষে"। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে মুজাহিদদের অন্তত বিশবার সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনের সংগঠকরা সর্বত্র প্রচার করে বেড়ান যে, যতদিন দেশে বিধর্মীদের শাসন বজায় থাকবে ততদিন এদেশ মুসলমানদের জন্য 'দারুল হারব' বলে গণ্য হবে। কিন্তু সরকার কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা, দীপান্তর ও যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়ার ফলে জেহাদের মূল শক্তি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ে। তথাপি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এনায়েত আলীর পুত্র আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু পর্যন্ত এ আন্দোলন চলতে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

মুসলমান সমাজে অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় জেহাদ আন্দোলনেরও প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন। বিধর্মী শাসিত দেশে মুসলমানদের জীবন ও ধর্ম রক্ষার তাগিদ থেকে এ আন্দোলনের নেতারা শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আন্দোলনের সমর্থনে বহু লোক এগিয়ে আসলেও বাস্তব অসুবিধার কারণে জেহাদীরা ব্যর্থ হন। বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর এ আন্দোলন পূর্বের মত আর কখনও শক্তি অর্জন করেনি। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর পরে আন্দোলনটি চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. জেহাদ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ স্থান —
   ক. বাংলাদেশ খ. কাশ্মীর
   গ. পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ঘ. সিন্ধু প্রদেশ

২. সৈয়দ আহমদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন —
   ক. নেপালে খ. পেশোয়ারে
   গ. খাইবার গিরিপথে ঘ. বিহারে

৩. বালাকোটের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় —
   ক. ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে

৪. ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করে —
   ক. ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. কিভাবে জেহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়?
২. সৈয়দ আহমদ কিভাবে সমাজ সংস্কার শুরু করেছিলেন?
৩. জেহাদ আন্দোলনের দুর্বল দিকগুলো বর্ণনা করুন।

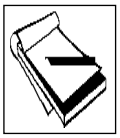

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৮ ঃ রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলায় ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলনের বিবরণ দিন।
২. ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রকৃতি ও ফলাফল আলোচনা করুন।
৩. ফরায়েজী আন্দোলন কি? এই আন্দোলনে হাজী শরীয়ত উল্লাহর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪. ফরায়েজী আন্দোলনে দুদু মিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।
৫. তিতুমীরের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি কি ছিল? উল্লেখ করুন।
৬. জেহাদ আন্দোলনে সৈয়দ আহমদ শহীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ

পাঠ - ৮.১	⇒	১. গ	২. খ	৩. গ	৪. ক
পাঠ - ৮.২	⇒	১. গ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ - ৮.৩	⇒	১. খ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ - ৮.৪	⇒	১. খ	২. গ	৩. গ	৪. খ
পাঠ - ৮.৫	⇒	১. গ	২. খ	৩. ক	৪. গ